প্রথম অধ্যায়

বাঁকুড়া জেলা : তথ্য পরিসংখ্যান ও ভাষাঞ্চল

লাল মাটির দেশ বাঁকুড়া। রক্তমুখী কাঁকুরে মৃত্তিকা, মৌন নিরব উচ্চ-অনুচ্চ পাহাড়-পর্বত, নিরবচ্ছিন্ন দিগন্তবন্দী বনানী, তৃণহীন গৈরিক-বন্ধুর ভূ-খন্ড — এমন এক বৈরাগ্যের প্রতীক যা অনির্বচনীয় শ্রদ্ধায় আনত নয়নে, অবনত মস্তকে করজোড়ে প্রণম্য। এই বাঁকুড়ার সমীরণে প্রবাহিত আধ্যাত্মিক মনন, মৃত্তিকায় মিশ্রিত প্রাচীন ইতিহাস, আবহমান নদীর কুলুধ্বনি, আদিম অরণ্যের মদিরা যা স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত বহন করে চলেছে সুদূর ভবিষ্যতে। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির গুঞ্জনে মুখরিত হয়েছে বাঁকুড়ার অগণন মৌলিক উপাদান। বস্তুতঃ কংক্রীট সভ্যতা থেকে পিছিয়ে থাকলেও কাঁকুরে মাটির দেশ বাঁকুড়া, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ভাণ্ডার যা অতীতের অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। সংস্কৃতির পাশাপাশি সমাজ ও ভাষা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে যা বর্তমানে অনুসন্ধানী গবেষকদের স্বর্ণখনি বিশেষ।

১. ভৌগোলিক পরিচিতি : ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার অবস্থান ভিন্নরূপ। আয়তনে চতুর্থস্থানাধিকারী বাঁকুড়া জেলার উত্তর গোলার্ধে ২২°৩৮' থেকে ২৩°৩৮' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৬°৩৬' থেকে ৮৭°৪৫' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। রুক্ষ জলবায়ু বিশিষ্ট ত্রিভুজাকৃতি লাল মাটির দেশ বাঁকুড়া। এর আয়তন ৬৮৮২.২ বর্গ কিলোমিটার। নাতিদীর্ঘ বৃক্ষবিরল কঙ্করযুক্ত ল্যাটারাইট মৃত্তিকা, অসমতল উচু-নীচু বন্ধুর ভূ-খণ্ড, জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়-পর্বত, শাল-মহুয়া-পিয়াল-গুল্মলতা আচ্ছাদিত বনভূমি সমন্বিত এক বিচিত্র ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান এই জেলা। জেলার এই ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক কারণেই এখানকার ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে তাতেও দিয়েছে বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য।

২. প্রাচীন ঐতিহাসিক পটভূমি : কারা কবে কোন সময়ে এই অঞ্চলের পত্তন করেছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদের বিতর্কের অবসান আজও হয়নি। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল ছিল ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দ্বারকেশ্বর নদ ও কাঁসাই নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম (শুশুনিয়া, মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্ত, পুরুলিয়া জেলার কিয়দংশ) থেকে মনুষ্য জাতির জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। এইরূপ প্রস্তর যুগের নিদর্শন থেকে বোঝা যায় এই সমস্ত

অঞ্চলগুলিতে আদিম মানুষের বসবাস ছিল। খ্রীঃ চতুর্থ শতকে এই অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে এসেছিলেন জৈন ধর্মগুরু মহাবীর। প্রাচীন গ্রন্থ 'আচারাঙ্গে সূত্র' (খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত) থেকে জানা যায় খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ় অঞ্চল নামে এক জনপদ ছিল। নবম - দশম শতকে রাঢ়ের দুটি বিভাগ হয় - উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। আর দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যমণি এই মল্লভূম (বাঁকুড়া জেলা)। "মল্লরাজাই বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ অংশ জুড়ে এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক, সামজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন। তখন থেকে ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশের পরিবর্তনের ইতিহাসই এই জেলার বৃহত্তর জনজীবনের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের মূল প্রবাহটি নিয়ন্ত্রিত করেছিল"[১]

৩. বাঁকুড়া জেলার উদ্ভব : বিবর্তমান বাঁকুড়া জেলা, ভাগ্যের পরিহাসে বারবার পরাজিত হয়েও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মল্লভূম রাজা গোপাল সিংহের আমলে রাজ্যের অধিবাসীগণ নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করেছেন। বার বার মারহাট্টাদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করে বীরত্বের পরিচয় রেখে রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন। পতন ঘনিয়ে এলো চৈতন্য সিংহের সময়কালে–ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহবিবাদ অধঃপতনের মূল সূত্রপাত। পরবর্তীকালে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে, তদুপরি মারহাট্টাদের আক্রমণে মল্লভূম রাজ্য হতশ্রী হয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ মল্ল পরিবারের অন্তঃকলহ বিবাদ, মারহাট্টা আক্রমণ, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস, ব্রিট্রিশ সরকারের কায়েমি স্বার্থ, প্রশাসনিক সুবিধা, জনস্বার্থের তাগিদে, ভাঙ্গা-গড়া বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের 'বাঁকুড়া' জেলার ভৌগোলিক রূপটি গঠিত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৮৮১ সালে পরিবর্তনশীল পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে একটি পুর্ণাঙ্গ জেলায় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

৪. নাম কেন বাঁকুড়া : বাঁকুড়াকে কেন্দ্র করে অনুসন্ধানী গবেষকদের মন তর্ক-বিতর্কে উত্তাল হয়ে উঠেছিল যা আজও স্তিমিত হয়নি। এই জেলার নামকরণের উৎস বা কারণ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। এই নামকরণকে কেন্দ্র করে নানা মুনির নানা মত, কেউ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

আবার কেউ বা ভৌগোলিক বিশ্লেষণের নিরিখে আবার কেউ বা লোককাহিনীকে অবলম্বন করে বাঁকুড়া জেলার নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. খ্যাতনামা পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঁকুড়া নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ :

১. আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, জনপ্রিয় এক্তেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ শায়িত শিবলিঙ্গ বাঁকাভাবে অবস্থিত। (ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ✓বক্র>বাঁকা) বাঁকু তার সঙ্গে 'ড়া' যুক্ত হয়ে বাঁকুড়া।

অপরদিকে তাঁর অন্যমত, স্থানীয় পাঁচটি কুণ্ড অর্থাৎ জলাশয় বা ঝর্ণা বাম দিকে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলের নাম হয় বামকুণ্ডা >বাঁকুড়া। আরো পরবর্তী সময়ে এই শহরাঞ্চলের নাম হয় বাঁকুড়া। বস্তুতঃ পরিসংখ্যান গণনা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায়, বাঁকুড়া মৌজায় প্রাচীন জলাশয় বা ঝর্ণার কোন অস্তিত্ব নেই।

২. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, প্রাচীন জনগোষ্ঠীর লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের "বাঁকুড়া রায়" এঁর নামানুসারে এই জেলার নাম বাঁকুড়া।

৩. ও ম্যালি তাঁর "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বাঁকুড়া" গ্রন্থে বলেছেন -

ক) জনপ্রিয় রায় পরিবারের মুখ্য সামন্ত বা সর্দার বঙ্কু বা বাঁকুড়া রায় নামানুসারে জেলার নাম বাঁকুড়া।

খ) লোকশ্রুত বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের ২২ জন পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র "বাঁকুড়া রায়" জয় বেলিয়ার গভীর জঙ্গল কেটে রাজধানী স্থাপন করেন তাঁর নামানুসারে পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলা হিসাবে পরিচিত হয়।

খ. ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দৃষ্টি রেখে বাঁকুড়া নামকরণের তাৎপর্য :

১. নদীর 'বাঁক' থেকেও 'বাঁকুড়া' শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে। রাজগ্রাম ও এক্তেশ্বর এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদের বাঁকে 'বাঁকুড়া' শহরের অবস্থান। নদীর বাঁকের "বাঁক" এবং "ওড়া" (বাসস্থান বা গৃহসমষ্টি) মিলিত হয়ে বাঁকুড়া হয়েছে।

২. বাঁকুড়া শহরটি ব-দ্বীপ বিশেষ। দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেশ্বরী — এই দুটি নদ-নদীর সঙ্গমস্থলে বাঁকুড়া শহরটি অবস্থিত। এককালে এই শহরের ভূমিভাগ ছিল জলাভূমি। উক্ত দুই নদ-নদীর পলি সঞ্চয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে উচ্চ স্থলভূমি। নদীর বাঁকের চরভূমি এবং চাষের জমিকে "বাঁকুড়ি" বলে। আদিবাসীদের উচ্চারণে বাকুড়ি>বাঁকুড়ি>বাঁকুড়া ।

গ. ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাঁকুড়া নামের তাৎপর্য :

১. ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, বাঁকুড়া = বাঁকু+ড়া। শব্দটি সংস্কৃত 'বক্র' থেকে প্রাকৃত বঙ্ক>বক্ক>বাঁকু। 'ড়া' শব্দটি শ্রেষ্ঠ অর্থে অথবা বৃহত্তর অর্থে অথবা সংরক্ষিত স্থান অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

২. বাঁকুড়া শব্দটি অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল অথবা মুণ্ডা ভাষার অন্তর্গত সাঁওতালী শব্দ। বাঁকুড়া = বাঞ+কুড়য়া (কুড়য়া>কুড়া) বাঞ শব্দের অর্থ হল "না"। কুড়য়া শব্দের অর্থ হল কুঁড়ে বা অলস। অর্থাৎ যারা কুঁড়ে বা অলস সম্প্রদায় নয়। অনার্য গোষ্ঠী বহুকাল থেকে পদদলিত, অবহেলিত সম্প্রদায়। এই লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিবাদী ভাষার নামানুসারেই জেলার নাম বাঁকুড়া।

৩. অস্ট্রিক গোষ্ঠী কোল ও মুণ্ডা ভাষায় "ওড়াঃ" শব্দের অর্থ গৃহ বা গৃহের সমষ্টি। গৃহ সমষ্টি বোঝাতে অপভ্রংশ "ওড়া" অথবা "ড়া" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যয়ের মতে, "ড়া" শব্দ দ্বারা বিশেষ সংরক্ষিত স্থান বোঝায়। "ড়া" প্রত্যয় অস্ট্রো - এশিয়াটিক ভাষা থেকে আগত।

৪. সংস্কৃত ✓বক্র>বঙ্ক। বঙ্ক শব্দের নাসিক্য ভবন "বাঁকা" আদর অর্থ "উ" প্রত্যয় যোগে বাঁকু (বাঁকা+উ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এই শহরে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রূপে (মদন মোহন, গোপাল, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতি) পূজিত হন। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় স্বার্থিক 'টক' প্রত্যয় জাত 'ড়া' প্রত্যয় যোগে বাঁকুড়া শব্দের উৎপত্তি।

ঘ. প্রাচীন গ্রন্থ ও লোক কাহিনী পরম্পরা থেকে বাঁকুড়া জেলার নামের তাৎপর্য :

১. রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর "ধর্মমঙ্গল" কাব্যের আত্মজীবনীতে ধর্মঠাকুরের কৃপালাভের বর্ণনা করে বলেছেন, "আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম / বারদিনে গীতগাও শুন রূপরাম"। অর্থাৎ রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের নামানুসারে জেলার নাম বাঁকুড়া।

২. মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর "অভয়মঙ্গল" কাব্যে বলেছেন,

"সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায় / শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত"

৩. সীতারাম দাস তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বাঁকুড়া রায়ের কথা তুলে ধরেছেন।

৪. মানিক রাম গাঙ্গুলি তার 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বেলডিহার বাঁকুড়া রায়ের কথা তুলে ধরেছেন।

ঙ. লিপি, চিঠিপত্র, মানচিত্রে বাঁকুড়ার তাৎপর্য :

১. ও ম্যালি তাঁর "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বাঁকুড়া" ১৯০৮ এ উল্লেখ করেছেন, রেলপথ স্থাপনের সময় বাঁকুড়া পৌর এলাকা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ১৮৮১ সালে জেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়।

২. J.E guastrcll, 1863 সালে জিওগ্রাফিক্যাল রিপোর্ট-এ উল্লেখ করেছেন, বাণকুণ্ডা সিভিল স্টেশন থেকে বা বর্তমানে বাঁকুড়া (বাণকুণ্ডা) জেলা।

৩. ১৯৭৯ সালে রেনলের মানচিত্রে 'BANCOORAH' কথার উল্লেখ আছে।

৪.বাঁকুড়া Record room এর মানচিত্রে উল্লেখ আছে Sheet No. 23 moon cireuit No. 2 dist BANCOORAH, sarvey edin session 1854-551.

উপরিউক্ত বিভিন্ন মতাদর্শের আলোকে বুঝতে পারি প্রশাসনিক ভাবে জেলার নাম বাঁকুড়া হবার বহু পূর্বেই এই নাম চলে এসেছে।

৫. প্রশাসনিক ব্যবস্থা : বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া, পূর্ব দিকে মেদিনীপুর ও হুগলী এবং উত্তরে বর্ধমান অবস্থিত। এই জেলায় দণ্ডায়মান পাহাড়-পর্বত — বিহারীনাথ পাহাড় (৪৪৮মি.), শুশুনিয়া, কোড়ো, মশক, লেডী; নদ-নদী — দামোদর, বোদাই, দারকেশ্বর, গন্ধেশ্বর, বিড়াই, শিলাই, কাঁসাই; বন-জঙ্গল — শালতোড়া, রায়পুর, শুশুনিয়া, ঝিলিমিলি, রানিবাঁধ, জয়পুর, সোনামুখী; মৃত্তিকা — ল্যাটরাইট মৃত্তিকা, কাঁকুরে, ও বালিপূর্ণ মৃত্তিকা; জনগোষ্ঠী — অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ইন্দো, ইউরোপীয় প্রজাতির মনুষ্য সম্প্রদায় বসবাস করে। এই জেলায় পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বনাঞ্চল, মৃত্তিকা, জলবায়ু, মানবগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য থাকার কারণে এখানকার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্ম কালে যেমন অত্যধিক গরম, শীতকালে ততোধিক ঠাণ্ডা। বৃষ্টিপাত কখনো মরীচিকা সম, কখনো বন্যাসম। কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত সুদূর সবুজ অরণ্য, কোথাও ধূ-ধূ-প্রান্তর। কোথাও ঘন জনবসতিপূর্ণ কোলাহল মুখর, কোথাও জনপ্রাণী হীন মৌন নিরব।

ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক বৈষম্যের দিক টিকে লক্ষ্য রেখে ২০১১ সালের গনণায় প্রাপ্ত পরিকাঠামো ও পরিসংখ্যানগত দিকটিকে তুলে ধরা হলঃ (Source: District statistical hand book, Bankura-2010-11)

আকৃতি - ত্রিভূজাকৃতি

আয়তন - ৬৮৮২.২ বর্গ কিলোমিটার

বার্ষিক বৃষ্টিপাত - ১৩০০ মিলি মিটার

সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত - ১৭৪০ মিলি মিটার

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা - ৪১ ডিগ্রি

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা - ৬ ডিগ্রি

মহকুমা ৩টি (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, খাতড়া)

পৌরসভা - ৩টি (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী)

মোট জনসংখ্যা - ৩৫৯৬২৯২

পুরুষ সংখ্যা - ১৮৪০৫০৪

মহিলা সংখ্যা - ১৭৫৫৭৮৮

ব্লক - ২২ টি ব্লক

বাঁকুড়া জেলার ২২ টি ব্লক

বাঁকুড়া মহকুমা	বিষ্ণুপুর মহকুমা	খাতড়া মহকুমা
বাঁকুড়া - ১	বিষ্ণুপুর	খাতড়া
বাঁকুড়া - ২	কোতুলপুর	ইন্দপুর
ছাতনা	জয়পুর	হীড়বাঁধ
মেজিয়া	সোনামুখী	রানিবাঁধ
গঙ্গাজলঘাটি	ইন্দাস	সারেঙ্গা
ওন্দা	পাত্রসায়ের	রাইপুর
শালতোড়া		সিমলাপাল
বড়জোড়া		তালডাংরা

জনসংখ্যা - ৩৫৯৬২৯২

গ্রাম সংখ্যা - ৫১৮৭

গ্রাম পঞ্চায়েত - ১৯০

মৌজা - ৩৮২৭

গ্রাম সংসদ - ৮১৯৬

পুলিশ স্টেশন - ২৩

সাক্ষরতার হার - ২২৬৪০১৩ (৭০.৯৫%)

সাক্ষর মহিলা - ৯৪২২১৯ (৬০.৪৪%)

সাক্ষর পুরষ - ১৯৬৭৬৯ (৮১.০০%)

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র - ৪৪৮

প্রাথমিক বিদ্যালয় - ৩৫৫১

নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয় - ৩৪৮

উচ্চ বিদ্যালয় - ২৪০

উচ্চ মাদ্রাসা - ৩

মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় - ১৮৯

মহাবিদ্যালয় - ১৫

টেকনিক্যাল কলেজ - ৩

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ - ২

মেডিকেল কলেজ - ১

জেলা গ্রন্থাগার - ১

মহকুমা গ্রন্থাগার - ৭

২২ টি ব্লকের বাচক গোষ্ঠী যাদের কথ্য ভাষা বাংলা। উক্ত স্থানগুলি থেকে বাংলা প্রবাদগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার বাংলা সহ অন্যান্য বাচক গোষ্ঠী লোক সংখ্যা :

বছর	বাংলা	সাঁওতালি	হিন্দি	তেলেগু	উর্দু	ওড়িয়া	মাড়য়ারী	মুণ্ডারী	নেপালি	গুজরাটি	পাঞ্জাবী	নেপালি	অন্যান্য	মোট জনসংখ্যা
২০০১	২৮৬৯৭৪৫	২৫৯৪৬০	১৪৮৭৯	২৭১৩	১২৬৪	৭৩৫	৬৫৪	৩৯৮	৩৪৬	৩০৫	২৪৫	২২৩	৭৪৪১	৩১৯২৬৯৫

৬. বাঁকুড়া ভাষাঞ্চল : আবহাওয়া ও জলবায়ুগত কারণে বাঁকুড়া জেলার প্রাকৃতিক রুক্ষতা এখানকার মানুষের ভাষার উপর প্রভাব পড়েছে। বাহ্যিক আকৃতি এবং ভাষা, আপাত কঠিন ও কর্কশ মনে হলেও, প্রকৃতিতে এরা কোমল ও আদ্র। কথ্য ভাষার কর্কশতা বা রুক্ষতা বহিঃপ্রকাশ পেলেও অন্তরের গভীরে তারা সহজ-সরল-অনাড়ম্বর প্রকৃতির। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিকে বাঁকুড়ার মানুষ কৃষ্ণে গৌরে, কঠিনে-কোমলে মিশ্রিত।

অপরদিকে এই জেলায় ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটি বড়ই বিচিত্র। একই জেলার অন্তর্গত হয়েও উত্তর বাঁকুড়ার-ইন্দাস, পাত্রসায়ের, সোনামুখী, অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমের রানিবাঁধ, হীড়বাঁধ, খাতড়া, ইন্দপুর, ছাতনা, তালডাংরা, সিমলাপাল, অঞ্চলের কথ্য ভাষার পার্থক্যটি চোখে পড়ার মতো। আবার উত্তর বাঁকুড়ার বা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার সাথে পূর্ব বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, জয়পুর, কোতুলপুরের ভাষা বৈষম্যটিও লক্ষ্য করার মতো।

বাঁকুড়াকে স্বতন্ত্র করেছে মানুষগুলির মুখের ভাষা, তার বিশিষ্ট বাক্‌রীতি, বিশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ, উচ্চারণ ভঙ্গি যা এই অঞ্চলের মানুষগুলি বিশিষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত। এই ভাষা মূলত অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষার মিশ্রিত রূপ। এছাড়া এই অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা ভাষাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। বস্তুতঃ একই জেলার অন্তর্গত হয়েও এখানে অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাক্ষরতার হার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, কুটির শিল্প,আবহাওয়া, জলবায়ু, মৃত্তিকা, নদ-নদী, বনভূমির পরিমাণের, উপর নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের ভাষা ছাঁদ। তাই একই অঞ্চলের অন্তর্গত হয়েও ভাষার বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। পরিসংখ্যানগত পরিকাঠামো অনুযায়ী বাঁকুড়ার ভাষাঞ্চলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. উত্তর বাঁকুড়া : বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস।

খ. দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া : রানিবাঁধ, হীড়বাঁধ, খাতড়া, ইন্দপুর, ছাতনা, শালতোড়া, তালডাংড়া, ওন্দা, রাইপুর, সিমলাপাল, বাঁকুড়া, গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া।

গ. পূর্ব বাঁকুড়া : জয়পুর, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর।

(ক) বর্ধমান ঘেঁষা উত্তর বাঁকুড়ার অন্তর্গত বড়জোড়া, সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, পাত্রসায়ের, ইন্দাস রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্গত। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বর্ধমান ভাষাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসে মান্য ভাষাকে আয়ও করেছে। প্রবাদে সেই ভাষার পরিবর্তনটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। শিষ্ট ভাষার মূল থেকে কিছু পরিবর্তিত হয়ে এই আঞ্চলিক রূপটি এসেছে। রাঢ়ী উপভাষার প্রয়োগ যেমন এখানে পরিলক্ষিত হয় তেমনি ঝাড়খন্ডী ঘেঁষা উপভাষাও লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের জলবায়ু মৃত্তিকার বিশিষ্টতার দরুন মানুষগুলির বাক্‌ব্যবহার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট আদ্র প্রকৃতির। এখানকার কথ্য ভাষা রাঢ়ী হলেও শিষ্ট ভাষা থেকে অনেকাংশ পৃথক। বস্তুতঃ যারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা তাদের একটা নিজস্ব কথা বলার ধরন বা টান (Accent) লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমান অঞ্চলের ভাষাভাষী মানুষের সাথে এদের অনেকাংশে মিল পরিলক্ষিত হয়। তবুও ভাষার মৌলিক উচ্চারণ রীতি, বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দভাণ্ডার বাঁকুড়ার অধিবাসীদের স্বতন্ত্র করেছে। এই অঞ্চলের বাংলা প্রবাদের মাধ্যমে উত্তর বাঁকুড়ার ভাষা রীতিকে তুলে ধরতে পারিঃ

১. মারিস না মারিস না মুখুজ্জ্যেরবরা (পাত্রসায়ের)।

২. খড় জ্বালে সরুচুকলি, মন্দা জ্বালে আঁশকে / আঁশকে খেয়ে ফোর গুনবি, নইলে যাবি ফসকে। (বীরসিংহ)

৩. সুমিষ্ট করব বলে আমড়া খেতে আসা / জঁন্দার ডরে পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসা। (পাত্রসায়ের)

৪. উপর থেকে পড়ে গেল দুমুখা সাপ / যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। (পাত্রসায়ের)

৫. কাঁচায় না নুইলে বাঁশ / পাকাতে করে ট্যাঁস ট্যাঁস। (ইন্দাস)

৬. বৌ আমার রান্তে জানে নাই কুলে বেগুনে / ফু দিয়ে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে। (পাত্রসায়ের)

উপরিউক্ত বিশেষ কয়েকটি প্রবাদের মাধ্যমে লক্ষ্য করতে পারি, রাঢ়ী উপভাষার প্রভাব উত্তর দিকে যথেষ্ট রয়েছে। যদিও পুরোপুরি রাঢ়ী নয় আবার সম্পূর্ণ ঝাড়খন্ডীও নয়। অর্থাৎ এই অঞ্চলের মানুষের কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে যা সহজেই শনাক্তকরণ করা যায় :

অ. নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার : বরা (শূকর), জঁন্দা (টক), সরুচুকলি (পাটিসাপটা পিঠে চাল ও ডাল দিয়ে তৈরী গোলাকার পাতলা রুটির মতো পিঠে), আঁশকে (চালের এক ধরনের গোলাকার বাটির আকারে মোটা পিঠে বিশেষ)।

আ. বর্ধমান ও হুগলী ঘেঁষা মানুষের সংস্পর্শে এসে রাঢ়ী ভাষাকে আয়ত্ত করেছে। তাই দক্ষিণ-পশ্চিমের 'আঁশক্যা পিঠ্যা' হয়ে গেছে 'আঁশকে পিঠে'। মেয়্যা>মেয়ে, খ্যাত্যেঁ>খেতে। অর্থাৎ অ্যা বা আ>এ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

ই. বাঁকুড়ার মানুষেরা দ্রুত কথা বলে তাই একটি বাক্যের সাথে আর একটি বাক্য জড়িয়ে গিয়ে সংকোচন ঘটে। এই অঞ্চলেও তার ব্যতিক্রম নয়। রাঁধতে>রান্তে

ঈ. "মারুস না মারুস না মুখুজ্জ্যার বরাটা" (বিষ্ণুপুর) উক্ত প্রবাদ থেকে বোঝা যায় পূর্ব দিকের কর্কশতা থেকে উত্তর দিকের ভাষা কিছুটা হলেও কোমল।

উ. দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের ভাষায় 'য' ফলা বা '্য' ব্যবহার ততোধিক নেই প্রত্যেক শব্দে শেষে।

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া হল পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর এর সন্নিকটস্থ স্থান। বাঁকুড়া, খাতড়া, রানিবাঁধ, হীড়বাঁধ, ইন্দপুর, সিমলাপাল, ছাতনা, শালতোড়া, তালডাংরা, রাইপুর, বাঁকুড়া, সারেঙ্গা, গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া অঞ্চলের ভাষা সম্পূর্ণ ঝাড়খণ্ডী উপভাষার অন্তর্গত। যদিও এখানকার ভাষার টোন বা মৌলিক শব্দভাণ্ডার ঝাড়খণ্ডী ভাষা থেকে স্বতন্ত্র করেছে। ভূ-প্রকৃতি এখানকার মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এখানকার মানুষগুলি কোণঠাসা হয়েছে ফলে মান্য ভাষার প্রচলন একেবারেই নেই। বাঁকুড়ার পশ্চিমে পুরুলিয়া ঘেঁষা নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল - ঝিলিমিলি, বিহারীনাথ, জোড়দা, রাইপুর। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাবে চাষবাস, বিড়ি তৈরী, পাতা তৈরী ছাড়া জীবিকার অন্য উপায় নেই বললেই চলে। সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলের মানুষরা তালপাতার পাখা, খেজুর গাছের ঝাঁটা, ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি হাতে তৈরী জিনিসপত্র, হাটে-বাজারে বিক্রি করে জীবন ধারণ করে। উপার্জনের অন্যান্য উপায়গুলি বড় বিচিত্র — তসরলাডু (গুটিপোকা), কুরকুট (পিঁপড়ের ডিম) উপাদেয় আহার্য্য হিসাবে বিবেচ্য। মানুষ কংক্রীট সভ্যতা থেকে বহুদূরে প্রকৃতির ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তাই কলকাতা ভাষাভাষী (রাঢ়ী) মানুষের সাথে সম্পর্ক একেবারেই গড়ে ওঠে নি। যদিও এখানকার মানুষেরা ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথাবলে তবুও শব্দ প্রয়োগের বিশিষ্ট কৌশলে এই অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

ভৌগোলিক কারণে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষার প্রভাব যেমন স্পষ্ট তেমনি সাঁওতালি ভাষার প্রভাবও বহুলাংশে লক্ষ্য করা যায়। "ড়" র ব্যাপক প্রয়োগ - মুনিষ>মুড়িষ বা কাঁড়া। ব্যাতঁ, জঁন্দা, কঁকা, ডিংলা এই অঞ্চলের নিজস্ব শব্দ। বাক্‌ব্যবহার, বাক্যগঠন, বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। এই অঞ্চলের বাংলা প্রবাদের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার ভাষা রীতিকে তুলে ধরতে পারিঃ

১. লিইধন্যার ধন হ্যাল্যে দিনে দ্যাখ্যে তারা / লির্ভাতারির ভাতার হ্যাল্যে বাসে বাপের পারা।(গঙ্গাজলঘাটি)

২. অতি ব্যাড় ব্যাড় না ঝড়ে প্যড়্যে য্যাবেক / অতি খাট হ্যও না ছাগল্যে মুড়্যাব্যেক। (বাঁকুড়া ২)

৩. সাত বউকে এ্যাকটি পিঠ্যা খইড়ক্যার ড্যাগে ঘি / গুন্দুর গুন্দুর ক্যরছ্যে বউরা খ্যাত্যে লারছ কি। (বাঁকুড়া ২)

৪. যাঁর বিঁহা তার হুঁশ নাই / পাড়াপড়শির ঘুঁমনাই। (শালতোড়া)

৫. বলতে লারি ল্যাজ্যে / আমার প্যাটট্যা বড় বাজ্যে। (বাঁকুড়া ২)

৬. হিয়াই নাই হুঁয়াই দঁড় / ভাতার চ্যায়েঁ নাং বড়। (কেঞ্জাকুড়া)

৭. ইদিন য্যায়েঁ উদিন আস্যে / ঘাটে বউ গেছেত্য গ্যেছেঁ। (ছাতনা)

৮. উদমা এঁড়্যা ভাঁউড়ে বুলে / এন্দাই সারা দিনটাই। (খাতড়া)

৯. নাই মামাকে কানা মামা। (খাতড়া)

১০. ট্যাঁটা গরুর চ্যায়েঁ শূন্য গুহাইল ভাল্য। (খাতড়া)

১১. খ্যাতেঁ্য পাই নাই চুঁয়া মুড়ি/কুল বাতাসার গড়্যাগড়্যি। (মেজিয়া)

দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার ভাষায় সাথে উত্তর-পূর্ব বাঁকুড়ার ভাষার পার্থক্যটি চোখে পড়ার মতো। ঝাড়খণ্ডী ভাষার অন্তর্গত হলেও দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌলিক বা নিজস্ব শব্দভাণ্ডার যা একমাত্র বাঁকুড়ারই। অর্থাৎ ঝাড়খণ্ডী ভাষার অন্তর্গত হলেও বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা স্বতন্ত্র একমাত্র ঐ অঞ্চলের মানুষেরাই উপরিউক্ত ভাষায় কথা বলতে পারে এবং বুঝতে পারে :

অ. নিজস্ব শব্দভাণ্ডার : পারা (মতন), গ্যাঁড়া বা খাট (বেঁটে), গুন্দুর গুন্দুর (ফিসফিস করে কথা বলা), খইড়ক্যা (কাঠি), উদমা (হঠাৎ করে), হিঁয়াই, হুঁয়াই (এদিকে,ওদিকে), ব্যাজ্যে (যন্ত্রণাকরে), এন্দাই (এমনি)

আ. সমাস বদ্ধ পদের প্রয়োগ : লির্ভাতারি, লিইধন্যা

ই. অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ : চ্যায়েঁ, গ্যেছেঁ কর্যে।

ঈ. নঞর্থক ক্রিয়াপদের রূপঃ লয়, লারি, লারছ, য্যাবেক নাই,খ্যাবেক নাই.

উ. ইদিন, উদিন, উয়ার : এ>ই ধ্বনি এবং ও>উ ধ্বনির আগম।

ঊ. এই অঞ্চলের মানুষের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য হল আনুনাসিক ধ্বনির বহুল ব্যবহার চ্যায়েঁ, খ্যায়েঁ, হুঁশ, বিঁহা, ঘুঁম গ্যাছেঁ।

ঋ. বিকৃত অভিশ্রুতির প্রয়োগঃ চ্যায়েঁ, খ্যায়েঁ। অভিশ্রুতির শেষে ‘য’ফলার ‘্য’প্রয়োগ

৯. প্রত্যেক শব্দের শেষ শ্বাসাঘাত প্রধান। হব্যেক, যাব্যেক, গ্যছেত, ইত্যাদি।

(গ) রাঢ়ী ভাষার বিকৃত রূপটি বাঁকুড়ার পূর্ব দিকের বেশ কিছু ব্লকে লক্ষ্য করা যায় যেমন বিষ্ণুপুর, জয়পুর, সোনামুখী, কোতুলপুর, বাঁকুড়া সদর অঞ্চলে পেয়ে থাকি। কিছুটা ঐতিহ্যগত কারণে,

কিছুটা মৌলিকতার দরুন, কিছুটা মান্য ভাষার সংমিশ্রণে ভাষার বিকৃত রূপটি লক্ষ্য করতে পারি যদিও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে ঝাড়খণ্ডী ভাষার ব্যবহার অনড়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দরুন, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষতার জন্য কেন্দ্রবর্তী রাঢ়ী উপভাষাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। ফলে এখানকার মানুষেরা ঝাড়খণ্ডী ঘেঁষা রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে শহর থেকে আগত মানুষেরা এই অঞ্চলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে রাঢ়ী উপভাষা ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মিশ্রিত রুপটি লক্ষ্য করা যায়। যদিও কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষার রূপ ভিন্ন। বস্তুতঃ ঘরোয়া জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে (কথোপকথনের সময়) এই আঞ্চলিক রূপটি বহিঃপ্রকাশ পায় যখন তারা পরিবারের আবেগপূর্ণ ভাষায় কথা বলে। এই সব অঞ্চলের মানুষেরা একটি 'ভাষা বলয়' তৈরী করেছে যা এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তারা তাদের ভাষাতেই কথা বলে। বহিরাগতদের পক্ষে সেই ভাষা আয়ত্ত করা দুরূহ ব্যাপার তেমনি বহিরাগতদের সম্মুখে বাঁকুড়াবাসীর নিজস্ব ভাষা প্রয়োগও সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই 'ভাষা বলয়' তাদের সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীরাই ব্যবহার করে। পূর্ব বাঁকুড়ার কয়েকটি বাংলা প্রবাদের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব ভাষাটিকে শনাক্তকরণের চেষ্টা করা যেতে পারে :

১. ক্যান্দ গাছে ক্যাল্ল্যাই ট্যা। (বিষ্ণুপুর)

২. বাউরির বিরির ডাল। (বিষ্ণুপুর)

৩. চাঁউড়ি বাঁউড়ি মকর এখ্যান সেখ্যান সাঁই সুই / তারপদ্দিন আসবি তুই। (বিষ্ণুপুর)

৪. বন থেকে ব্যেরাল হাঁতি / লইটক্যা লইটক্যা কান / ব্যাঁত দিগে ছ্যেল্যা হয় / দেগরে ভগবান। (ভঁড়া)

৫. বাগ বাগদী কাঁড়া / ডাগলে না দেয় সাড়া। (ভঁড়া)

৬. কানের গড়াই চামনির বাসা। (বিষ্ণুপুর)

৭. ট্যানা লিয়ে টানাটানি। (সোনামুখী)

৮. আম খাচ্চু আম খা আঁঠির কি দরকার। (বিষ্ণুপুর)

৯. কুঠার আবার চানজলের ভয়। (জয়পুর)

১০. ঘুঘু দেখেচু ফাঁদ দেখুন্নাই। (বিষ্ণুপুর)

উপরিউক্ত প্রবাদগুলিতে পূর্ব বাঁকুড়ার ভাষাকে স্পষ্ট করেছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বোঝা যায় যে উক্ত অঞ্চলেরই ভাষা তা বলার অপেক্ষা রাখে না :

অ. নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার : ক্যান্দ (বিশেষ ধরনের ফল যা বাঁকুড়ার মাটিতেই দেখা যায়), ক্যাল্ল্যাই (কেন্নো), চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, এাখ্যান, সেখ্যান, সাঁই, সুই (বাঁকুড়ার বিশেষ পরব) ব্যাঁত (মুখ গহ্বর), বাউরি (বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায়,নিম্ন জাতি), কাঁড়া (মহিষ), কুঠা (কুষ্ঠরোগী), চামনী (ছোট উকুন), টেনা (জীর্ণ কাপড়ের টুকরো), মদুনি (বাড়ির চালের শীর্ষ অংশ), ঝিটচাল (চালের ঢালু নিম্নাংশ)

আ. এ> এ্যা স্বরধ্বনি প্রযোগ : ছেলে >ছ্যেল্যা।

ই. ঘরকে : অধিকরণে 'ক' এবং কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি।

ঈ. বাগ্‌যন্ত্রের কারণে ভৌগোলিক প্রভাবে প্রভাবিত) স্নানজল >চানজল।

উ. নঞর্থক বাক্যের বহুল প্রয়োগ : নাই, লিয়ে। আবার পূর্ব দিকেই অঞ্চলভেদে এবং ব্যক্তি ভেদে ছ্যা, ছ্যেল্যা, ছিলা, ব্যেট্যা, ছিলা ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

ঊ. দ্রুত কথোপকথনে ভাষা জড়িয়ে যায় বেরহল >ব্যেরাল।

ঋ. খাচ্ছিস>খাচ্ছ, দেখিস নাই>দেখুন্নাই, দেখেছিস>দেখেচু : বিচিত্র ধরণের ধ্বনির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বাঁকুড়ার ভাষাঞ্চল

উত্তর	দক্ষিণ-পশ্চিম	পূর্ব
১. যার বিয়ে তার হুশ নাই পাড়া পড়শির ঘুম নাই।	১. যাঁর বিঁহা তার হুশ নাই পাড়া পড়শির ঘুঁম নাই।	১. যার বিয়া তার হুশ নাই পাড়া পড়শির ঘুম নাই।
২. নাচতে জানে না উঠোনের দোষ।	২. নাইচত্যে জানে নাই উঠান বাঁকা।	২. নাচত্যে জানে নাই উঠান ব্যেঁকা।
৩. ঘুঘু দেখেছিস ফাঁদ দেখিস নাই।	৩.	৩. ঘুঘু দেখেচু ফাঁন্দ দেখুন্নাই।
৪. কানা গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।	৪. ট্যাঁটা গরুর চ্যায়েঁ শূন্য গুহাইল ভাল্য।	৪. কানা গরুর চাইত্যে শূন্য গুয়াল ভাল্য।
৫. নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো।	৫. নাই মামাকে কানা মামা।	৫. .....
৬.....	৬. বেশি সাদা হইল্যে বইলব্যেক কুঠ্যা।	৬. বেশি সাদা হলে বলব্যেক রগা।

উপরিউক্ত ভাষাঞ্চলগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে লক্ষ্য করা যায়, একটি সম্প্রদায় যে ভাষায় কথা বলে সেই সম্প্রদায়ের কথা বলার সময় তাদের নিজস্ব শব্দ ব্যবহার করে। ফলে নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিমা এবং বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডারের সৃষ্টি করে। একই ভাষার কথা যখন বিস্তৃত অঞ্চল থেকে ছড়িয়ে তাদের মধ্যে এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা কমে যায় তখন তাদের ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে ওঠে। বৃহৎ এলাকায় থাকা জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহার করে। তখনই ভাষার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, একটি জেলার পরিচয় গড়ে ওঠে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তেমনি সেই অঞ্চলের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় তারই বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কথ্য ভাষার মধ্য দিয়ে। অঞ্চল বিশেষের নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার ও মৌলিক বাচন ভঙ্গি বা উচ্চারণ ভঙ্গি অন্যান্য জেলার তুলনায় এই অঞ্চলের মানুষের ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, বৈবাহিক বন্ধন সূত্রে বাঁকুড়ার সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষার নিজস্বতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে। মান্য চলতি ভাষার প্রভাব, গ্রামঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষিত সমাজে কথ্য ভাষার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ভাষা সমাজের দর্পণ স্বরূপ। বস্তুতঃ কংক্রীট সমাজ বাঁকুড়ার সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষাকে আস্বাদন করতে না পারলেও এগুলি বাঁকুড়ার নিজস্ব সম্পদ। তাই সংরক্ষণের চেষ্টায় বহু গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই বিশিষ্ট ভাষারীতি। ভাষা বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রাম্য ভাষা ও সংস্কৃতির আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়েছে তাই বাংলার এই অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বাঁকুড়ার ভাষার গুরুত্ব অনেক ; সাহিত্যের দরবারেও তার গুরুত্ব সমধিক।

তথ্যসূত্রঃ ১.তরুণদের ভট্টাচার্য, 'বাঁকুড়া' পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-২, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২, পাতা-৬৭।